

আল্লাহ আমার রব

بنغالي

রব-এর অর্থ

www.with-allah.com



ড. মুহাম্মাদ সার্বার আল যামী
ড. আব্দুল্লাহ সালিম বাহুমাম

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাযালার পরিচয় লাভ করুন

<https://www.with-allah.com/bn>

আল্লাহ একটি শ্রুতিমধুর নাম। যার অর্থও অতিসুন্দর। যার মধ্যে রয়েছে প্রেম, হৃদয়তা ও ভালোবাসা। তেমনি এর মধ্যে রয়েছে একত্ববাদ, বন্দেগী ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য। তিনি কতই মহান!



মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করণ-

প্রথমত: আমার প্রতিপালক আল্লাহ:

{তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা}

{সূরা: আল-হাশর, আয়াত: ২৪।}

তিনিই আল্লাহ তায়ালার স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু তিনি নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। স্বীয় গুণ ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী উদ্ভাবন করেছেন। তিনি অবিনশ্বর, তাঁর সকল গুণাবলী চিরন্তন।

আল্লাহ তায়ালার প্রতিপালক। তিনি সকল বান্দাদেরকে নিজ ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন নেয়ামতরাজি দ্বারা প্রতিপালন করেন। এর চেয়েও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, তিনি তাঁর পছন্দের বান্দাদের অন্তর ও আত্মা এবং আখলাক সমূহ সংশোধন করেন, একারণেই সেসব বান্দাগণ আল্লাহকে এই মহান নামে ডেকেছেন অনেক বেশি। কেননা তারা রবের এমন রুুবুবিয়াতই কামনা করে থাকেন বেশি।

রব-এর অর্থঃ

রব এমন সত্তা যার কোন উপমা নেই। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে নেয়ামত দান করে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি সৃষ্টি ও নির্দেশের মালিক। কোন কিছুর সাথে সম্বন্ধ করা ব্যতিরেকে রব শব্দকে কারো জন্য ব্যবহার করা যায় না। যেমন 'রব্বুদ দার', 'রব্বুল মাল' ঘর বা সম্পদের মালিক। সম্বন্ধকরণ ছাড়া সাধারণ অর্থে রব শব্দ শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্ধারিত।

একজন ইলাহ ও মাবুদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানার আগেই মানুষ তার পালনকর্তার প্রয়োজনীয়তা ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতার বিষয়টি জানে এবং যেহেতু আখেরাতের সমস্যার সমাধানের আগেই দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের মুখোমুখি মানুষ, সেহেতু আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করার আগেই রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকারোক্তি করার বিষয়টি চলে আসে।

'রব' এবং 'রুবুবিয়াহ' শব্দদ্বয় মাহাত্ম্যপূর্ণ কিছু অর্থের অধিকারী। যেমন- ক্ষমতা, রিজিক, সুস্থতা, তাওফীক, যথার্থতা ইত্যাদি। মহান রব্বুল আলমীন বলেন:



{ যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন। যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। } [সূরা: আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৭৯-৮১।]

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ-

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করে, সত্যায়ন করে, বিশ্বাস করে এবং সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেনঃ আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলতঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। } [সূরা: ইবরাহীম, আয়াত-১০।]

মুমিন: যিনি আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখেন যে তিনি প্রতিপালক এবং সর্বশক্তিমান। এবং এই বিশ্বাসও রাখে যে, তিনি এককভাবে ইবাদতের উপযুক্ত।

আপনি শুধু অনুগ্রহ ও নেয়ামত লাভের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন। অথচ আপনি সুখে এবং দুঃখে উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

এমন সম্ভার ব্যাপারে কিভাবে প্রমাণ চাওয়া সমীচিন, যাঁর অস্তিত্বই প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ! তিনিই মহান।

যদি আমরা প্রতিপালকের অস্তিত্বের প্রমাণ অনুসন্ধান করি তবে নিচের বিষয়গুলো আমাদের সামনে চলে আসে-

প্রকৃতিগত প্রমাণ:

মাখলুক স্বভাবগতভাবেই স্রষ্টার উপর ঈমান রাখে। যার কলব ও মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহ তায়ালা এই প্রকৃতিকে বিলোপ না করে দিবেন সে তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি থেকে হটেবে না। ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে এর শ্রেষ্ঠ দলীল হচ্ছে রাসূল সা.-এর এই হাদীস- «প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত বা প্রাকৃতিক চেতনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, নাসারা ও অগ্নিপূজারী বানায়। যেমন জীব-জন্তুরা নিখুঁত পশুই জন্ম দেয়। তোমরা এর মাঝে কি কোন খুঁত দেখা!» (-বোখারী।)

প্রত্যেক মাখলুকই স্বভাগতভাবে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [সূরা: আর-রুম, আয়াত: ৩০।]

এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর সৃষ্টিগত প্রকৃতি ও ফিতরাতের প্রমাণ।

শয়তান যাকে প্ররোচিত করেনি আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ফিতরাতের প্রমাণই তার জন্য

সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।} [সূরা: আর-রুম, আয়াত-৩০।]

এর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।} [সূরা: আর-রুম, আয়াত-৩০।]

সুতরাং সুস্থ প্রকৃতি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। আর যাকে শয়তান গ্রাস করে নিয়েছে, তার কাছে এটি অস্পষ্ট থাকে এবং সে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দাবি করে। অথচ কোন বিপদাপদে পতিত হলেই সে আসমান মুখী হয়ে যায়। কারণ, সৃষ্টিগত প্রকৃতিই তাকে সেদিকে টেনে নেয়।



আল্লাহ শব্দটি মানুষের প্রকৃতিতে অঙ্কিত একটি নাম। সুতরাং এর জন্য কোন দলীল প্রমাণে উপনীত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

যুক্তিনির্ভর দলীল:

আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে এমন কিছু দলীল-প্রমাণ এবং শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা হচ্ছে নাস্তিক ছাড়া যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন-

১। প্রতিটি সৃষ্টিরই স্রষ্টা রয়েছেন, কারণ সৃষ্টি মানেই স্রষ্টার মুখাপেক্ষি। অথচ এসব সৃষ্টি নিজেদের মাধ্যমে নিজেরা অস্তিত্বপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কেননা কোন বস্তু নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ সৃষ্টির পূর্বে সে নিজেই অস্তিত্বহীন ছিল। তাহলে সৃষ্টিনিজেই নিজের স্রষ্টা হওয়া অবাস্তব। সুতরাং প্রতিটি ঘটনারই কোন না কোন সংঘটক রয়েছে। সৃষ্টি জগতের বস্তুসমূহের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রতিটি ঘটনা ও পরিণতির মাঝে যে অতুলনীয় শৃঙ্খলা, সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্য এবং পারস্পারিক সংযোগ রয়েছে তা সৃষ্টিসমূহের আকস্মিকভাবে অস্তিত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। প্রতিটি মাখলুকেরই একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আর যখন এই সৃষ্টিসমূহের আপনা আপনিই অস্তিত্বপূর্ণ হওয়া অসম্ভব এবং আকস্মিকভাবে তার অস্তিত্বও যখন অযৌক্তিক, তাই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে সৃষ্টিসমূহের অস্তিত্বদানকারী একজন রয়েছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর এই যুক্তিভিত্তিক দলীল এবং সুস্পষ্ট প্রমাণটি মহান আল্লাহ তায়ালাও উল্লেখ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন: {তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?}

[সূরা: আত-তুর, আয়াত: ৩৫।]

অর্থাৎ মাখলুক স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টি হয়নি। আর তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে তাদের স্রষ্টা হলেন মহামহিম সুমহান আল্লাহ তায়ালা। এ কারণে হযরত জাবির বিন মুতঈম রাযি যখন শুনলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম সূরা তুর -এর এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছেন- {‘তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাঙার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক?’}

[সূরা: আত-তুর, আয়াত: ৩৫-৩৭।]

তখন জাবির রা. মুশরিক ছিলেন, তিনি বললেন-- «এ আয়াতগুলো শুনে আমার অন্তর তো উড়ে যাওয়ার উপক্রম!» (-বোখারী)

২। সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহও তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন:

{তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে।} [সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১০১।]

কেননা নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের মাঝে দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহ তায়ালাই স্রষ্টা। এবং তাঁর প্রভুত্বের ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। একদা এক গ্রাম্য বেদুঈনকে বলা হয়েছিলো কিভাবে তুমি তোমার প্রতিপালককে চিনলে? তখন তিনি বললেন-পদচিহ্ন অতিক্রমকারীর প্রমাণ বহন করে, উটের মল উষ্টীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। তাহলে সুউচ্চ আসমান, সুপ্রসস্ত জমিন এবং উত্তাল সমুদ্র কেন সর্বশ্রেষ্ঠা এবং সর্বদর্শীর অস্তিত্বের প্রমাণ করবে না?

বস্তুত: আল্লাহর গায়েবী বিষয়াবলীর সামনে সকল মনুষ্য শক্তি অক্ষম ও অপারক হয়ে ঠায় দাড়িয়ে থাকতে বাধ্য। সুতরাং মানুষের জাগতিক ধারণার সাথে যখন ঈমান যুক্ত হয় তখনই কেবল সে দিশা লাভ করে।

৩। সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত এই পৃথিবী প্রমাণ করে যে এর মহাপরিচালক একক ইলাহ, একক প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর তিনি ছাড়া মানুষের আর কোন প্রতিপালকও নেই। আর এই বিশ্বজগতের যেমন একাধিক প্রতিপালক বা স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি একাধিক ইলাহ বা মাবুদের অস্তিত্বও অসম্ভব। মোটকথা, একই ক্ষমতাদার দুজন স্রষ্টার মাধ্যমে জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকাটা প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। মানুষের প্রকৃতিতে এই ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সুস্থ চিন্তার আলোকে একাধিক স্রষ্টা বা ইলাহের ধারণা বাতিল হয়ে যায়। আর এভাবেই দুজন ইলাহের প্রভুত্বও বাতিল হয়ে যায়।

শরঈ দলীল:

সব শরীয়ত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রহমতের পরিপূর্ণতার প্রমাণ বহন করে। কেননা এই বিধানাবলীর একজন বিধায়ক অবশ্যই আছেন। আর সেই বিধায়ক হলেন মহামহিম আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেয়গারী অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।}

[সূরা: আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১-২২।]

সব আসমানী কিতাবেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

ইন্দ্রিয়গত দলীল:

পুত-পবিত্র, সুমহান আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্ট, উৎকৃষ্ট, অনুভব ও অনুধাবনযোগ্য প্রকাশ্য দলীল প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই বিদ্যমান আছে। যেমন:

১। দোয়া কবুল হওয়া: মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে এবং বলে- হে আল্লাহ! আমাকে অমুক বস্তুটি দান করুন। অতঃপর সে যে ব্যাপারে দুআ করে, সে ব্যাপারে তার ডাকে সাড়া মেলে। এটা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে উপলক্ষিমূলক প্রমাণ। আর মানুষের অন্তর কেবল আল্লাহকেই ডাকে। আর আল্লাহ তায়ালাও তার ডাকে সাড়া দেন। এটিই প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। আর অতীতযুগ ও বর্তমান যুগের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমরা শুনি যাদের ডাকে আল্লাহ সাড়া দিয়েছেন। এটি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে অনুভবযোগ্য বাস্তবিক দলীল। আর এমন অনেক ঘটনা কোরআনেও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।}

[সূরা: আল-আহিয়া, আয়াত: ৮৩-৮৪]

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

২- জীবনের রহস্যের প্রতি মাখলুকের পথনির্দেশলাভও আল্লাহর অস্তিত্বশীলতার প্রমাণ। মানুষকে জন্মের সময় স্বীয় মাতার স্তন থেকে দুগ্ধপানের দিকে পথনির্দেশ করে কে? আর কে হৃদহৃদ পাখিকে পথনির্দেশ করে? যার ফলে সে জমিনের তলদেশে অবস্থিত পানির সন্ধান দিতে পারে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দেখে না? নিশ্চয়ই তিনি মহান আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {মূসা বললেনঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।} [সূরা: তাহা, আয়াত: ৫০]



মানসিকতা মূলত: বোধশক্তির দুর্বলতা এবং চিন্তাশক্তির ভারসাম্যহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৩। আল্লাহ তায়ালা যে সকল নিদর্শনাবলী দিয়ে নবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন সেগুলোও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। সেগুলোকে বলা হয় মুজেযা বা অলৌকিক বিষয়। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় নবী রাসূলদের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁদেরকে মনোনিত করেছেন। আর প্রত্যেক রাসূলকেই স্বীয় গোত্রের নিকট যখন প্রেরণ করেছেন মু'জিযা দিয়ে, যা প্রমাণ করে নবীগণের আনীত তাওহীদের সত্যতা।

৩। একত্ববাদে বিশ্বাসী বান্দার উপর তাওহীদের প্রভাব-

১। অস্থিরতা ও সন্দেহ প্রবণতা থেকে মুক্তি। যে জানতে পারবে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছে যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন; তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, জমিনে তাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন, এবং আসমান ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুকে তার অধীন করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নেয়ামত তাকে দান করেছেন। এতো কিছু জানার পর সে কিভাবে অস্থির মনোবৃত্তিতে এবং সন্দেহে নিপতিত হবে? অনন্তর সে আল্লাহ অভিমুখী হবে এবং তাঁর আশ্রয়ের প্রত্যাশী হবে। আর সে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকবে যে এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কল্যাণ-অকল্যাণ, ইনসাফ-জুলুম এবং সুখ-দুঃখ সবকিছুরই হোঁয়া রয়েছে।

আর যারা আল্লাহর প্রভুতে অবিশ্বাসী তারা তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণকারী। তাদের জীবনের কোন তৃপ্তি ও মূল্য নেই। তাদের পুরো জীবনটা শুধু অস্থিরতা ও দিশাহীনতায় ভরপুর। একের পর এক প্রশ্ন জাগে তাদের মনে কিন্তু তার কোন সদুত্তর নিজেরা পায় না। তাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকে না। একটা পর্যায়ে গিয়ে স্থির হয়ে যায় তাদের বুদ্ধি। সর্বদাই তাদের বুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সন্দেহ, অস্থিরতা ও উৎকর্ষার মাঝে থাকে। এটা হলো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের দুনিয়ার শাস্তি।

২- আত্মিক শান্তি:- নিশ্চয়ই প্রশান্তির একটি উৎস রয়েছে, আর তাহলো আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান। খাঁটি ঈমান

নাস্তিকতা বোধশক্তির দুর্বলতা, চিন্তাশক্তির ভারসাম্যহীনতা, অন্তরের অন্ধকারচ্ছন্নতা এবং জীবনের জন্য ধ্বংসের নামান্তর।



ও দৃঢ় বিশ্বাস, সন্দেহ যাকে পঙ্কিল করতে পারে না, কোন নেফাকী যাকে নষ্ট করতে পারে না- তা যে মানুষকে স্থিরচিত্ত ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী করে, তা দৃষ্টিসম্পন্ন ও নির্মোহভাবে দেখা যেকোন লোকই উপলব্ধি করে। যুগ যুগ ধরে এর ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ্য করি। এর বিপরীতে যারা ঈমানের দৌলত ও দৃঢ়বিশ্বাসের শিতলতা থেকে বঞ্চিত, তাদেরকেই সবচেয়ে অস্থির,

ঈমান নাজাতকে তুরাবিত করে।

সংকীর্ণ, উৎকণ্ঠায় মগ্ন দেখা যায়। তাদের জীবনের প্রকৃত কোন তৃপ্তি ও স্বাদ নেই। তারা আনন্দ ও আয়েশের সকল উপকরণের মাঝে

জীবনযাপন করেও প্রশান্তির দেখা পায় না। কেননা তারা জীবনের কোন উদ্দেশ্যই ঠিক করতে পারে না। পারে না কোন লক্ষ্য স্থির করতে। তাদের মন কোন মহাপ্রাপ্তির আশায় প্রফুল্ল হয় না। সুতরাং তারা অন্তরে প্রশান্তি ও হৃদয়ের প্রশান্ততার মাধ্যমে কিভাবে সফল ও সুখী হবে? অবশ্যই এই প্রশান্তি ঈমানের ফলসমূহের মাঝে একটি ফল। আর একত্ববাদ এমন একটি উত্তম গাছ যা

যে আল্লাহকে যথেষ্ট মনে করে, মানুষেরা তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

তার প্রতিপালকের নির্দেশে সর্বদাই এর পরিচর্যাকারীকে সফল প্রদান করে। এটি আসমানী উপহার, যা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে অবতীর্ণ করেন। যখন

মানুষ অস্থিরতায় ভুগবে তখন এই তাওহীদের প্রতি ঈমান তাকে দৃঢ়পদ করবে। যখন সে ক্রোধান্বিত হবে তখন তার মনে তুষ্টি ও সম্ভ্রষ্টির সৃষ্টি করবে। যখন সে সন্দেহে পতিত হবে তখন তাকে বিশ্বাসী করে তুলবে। মানুষ যখন সন্ত্রস্ত হবে তখন তার মাঝে ধৈর্য সৃষ্টি করবে, মানুষ যখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তখন তাকে সহনশীল করে তুলবে। হিজরতের সময় এই প্রশান্তিই রাসূলের অন্তরে পরিপূর্ণ ছিলো। তাই কোন চিন্তা ও বেদনা তাকে আঘাত করতে পারেনি। কোন ভয়ভীতি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কোন সন্দেহপ্রবণতা ও অস্থিরতা তাকে ভারাক্রান্ত করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন: { যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হওয়া না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। } [সূরা:

তাওবাহ, আয়াত: ৪০।]

আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর উপর তখন চিন্তা ও অস্থিরতা ছেয়ে গিয়েছিলো। তিনি নিজের জীবনের জন্য চিন্তিত হননি, বরং চিন্তিত হয়েছিলেন রাসূলের ব্যাপারে এবং একত্ববাদের দাওয়াতের ব্যাপারে।



আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক যতই দুর্বল হবে ততই সে বিভিন্ন প্রবণতা ও কুমন্ত্রনার লক্ষ্যবস্তু হবে।

এমনকি শত্রুরা যখন গুহা বেষ্টিত করে রেখেছিলো তখন তিনি বলেছিলেন-

«ইয়া রসূলুল্লাহ! তাদের কেউ যদি তার নিচের দিকে নজর করে, তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি এমন দু'জনের কথা ভাবছেন? যে দু'জনের সাথে তৃতীয় জন আল্লাহ আছেন।» (-মুসলিম)

এই প্রশান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন আলো ও নূর যা ভয়ে সন্ত্রস্ত ব্যক্তির অন্তরকে প্রশান্ত করে। অস্থিরতার সময়ে সে প্রশান্তি পায়। চিন্তামুক্তির মাধ্যমে সান্ত্বনা পায়। ক্লান্ত ব্যক্তি এর মাঝে বিশ্রাম পায়। দুর্বল ব্যক্তি এর মাঝে শান্তি পায়। পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এর মাধ্যমে সুপথ পায়। এই প্রশান্তি জান্নাতের জানালা স্বরূপ। যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে মুমিনদের জন্য খুলে দিবেন। জান্নাতের লোকদের তিনি দান করবেন এবং তাদের উপর তাঁর নূরসমূহ উজ্জ্বল হবে। তার ঘ্রাণ ও সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে। তারা পূর্বে (দুনিয়াতে) যে উত্তম কাজ করেছে তার মাঝে কিছুর প্রতিদান তাদেরকে আস্থাদান করাবেন। তাদেরকে ছোট কিছু দৃষ্টান্ত দেখাবেন যাতে তারা তার কিছু নেয়ামত দেখতে পারে। যাতে তিনি এই সকল ব্যক্তিবর্গকে রুহ, সুঘ্রাণ, শান্তি, নিরাপত্তা এগুলো দান করতে পারেন।

৩। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা অর্জন:- প্রতিটি বস্তু তাঁরই আয়ত্বাধীন। লাভ ক্ষতি করাও তাঁরই অধীনে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মহান সৃষ্টিকর্তা। তিনি রিযিকদাতা, অধিপতি, ব্যবস্থাপক, আকাশমণ্ডলী ও ভূমির লাগাম তারই অধীনে। এজন্য মুমিন যখন এটা বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তার ভাগ্যে যে উত্তম-অনুত্তম, উপকার-ক্ষতি লিখে রেখেছেন তা ছাড়া আর কোন কিছুই তার উপর নিপতিত হবে না-এমনকি সকল মানুষ তার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তার অনিষ্ট করতে চাইলেও না -তখন সে এমর্মে নিশ্চিত হবে যে, আল্লাহ একক সত্তা, তিনিই উপকারকারী, তিনিই ক্ষতির মালিক, তিনিই দাতা, ও তিনিই বাধাদানকারী। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা এবং তাঁর একত্ববাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যাবে। একারণেই যারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব ব্যক্তি ও বস্তুর ইবাদত করে, যারা কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না- তাদের তিনি তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:





{আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।}

[সূরা: আয-যুমার, আয়াত: ৬৩।]

৪। আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা:- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর জীবনে এই প্রতিক্রিয়াটি স্পষ্ট। একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস ও তাঁরই ইবাদতকারী ব্যক্তি যখন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব ও কতৃত্ব নিয়ে চিন্তা করে, তখন সে কেবল এটাই বলতে বাধ্য যে- {আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত করে আছেন।} [সূরা: আল-আনআম, আয়াত: ৮০।]

এবং তিনি বলেন- {তারা বলে} পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই,}

[সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯১।]

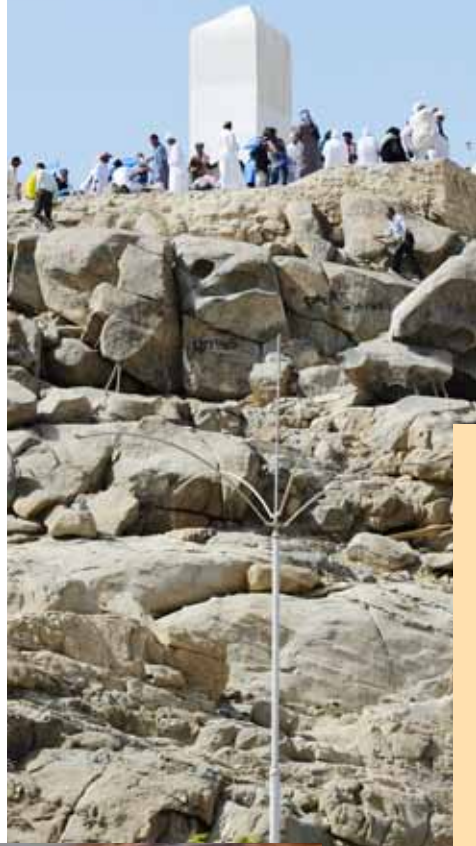
এগুলো সবই মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে অন্তরের সুগভীর সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। আর বান্দার সকল চেষ্টা-সাধনা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা ও তাঁর শরিয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তথা তাঁর প্রশ্নাতিত অনুকরণ এবং যেসব মাবুদ কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে না, তাদের কাউকে মহান আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে আল্লাহর প্রতি বান্দা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। যা মূলত: একত্ববাদের বিশ্বাসের প্রভাব।

অন্তরের অস্থিরতা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া ছাড়া দূর হয় না। অন্তরের নিঃসঙ্গতা তাঁর সাথে গভীর হৃদয়তা স্থাপন ছাড়া বিদূরিত হয় না। তাঁর পরিচয় জানা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া অন্তরের বিষণতা কাটে না।

৪- নাস্তিকতা ও তার ভয়াবহতা:

নাস্তিকতা হলো আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এটা অসুস্থ চিন্তাধারা, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অথবা সত্য উপেক্ষা কিংবা নিছক অহংকারের কারণেই হতে পারে। স্বল্প বুদ্ধি, অশুদ্ধ চেতনা এবং অন্তর্জগতের কলুষতা নাস্তিকের নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে তার অন্তরে অন্ধত্ব সৃষ্টি হয় এবং শুধু বস্তুবাদী চিন্তা ও মানসিকতাই অবশিষ্ট থাকে। তখন সে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা দিয়ে মানুষের বিশ্বাস ও আকীদাকে মূল্যায়ন করে। আর তাতেই সে হতভাগা ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং মানুষকে নিছক সাধারণ জীব মনে করে ও মানুষের বেলায়ও কেবল জাগতিক নিয়ম কানুনই প্রযোজ্য মনে করে।

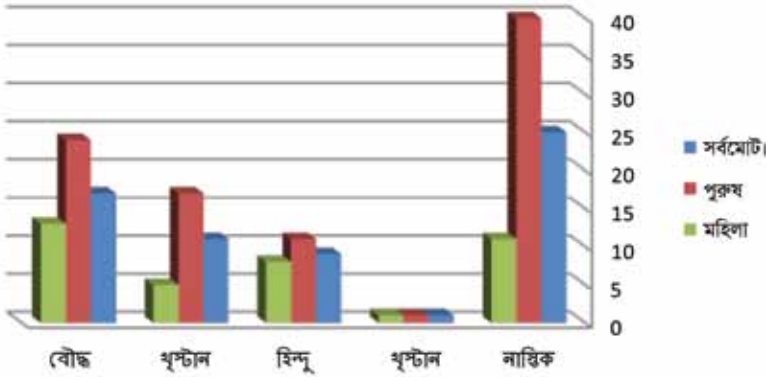
এসব ধ্যান-ধারণা মানুষকে আত্মিক সৌভাগ্য ও মানসিক প্রফুল্লতা থেকে বঞ্চিত করে নিছক ভোগবাদিতা এবং নিরস ও অগভীর যুক্তির গোলাম বানিয়ে দেয়। একজন নাস্তিক কোন মাবুদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফলে সে যেকোন সময় যা খুশি বলে ও যা খুশি করে। কারণ তার মাঝে কোন মাবুদের ভয়ে যে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা কিংবা তাঁর নির্দেশের কারণে কোন কাজ করার প্রবণতা থাকে না। এই চেতনা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া এতে আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী ও অপারের অনুকরণ তো হয়েই থাকে। এজন্য আল্লাহদ্রোহীদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও কবিরাও জীবনের কোন সঠিক দিশা না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মানব ইতিহাসে এর নজীর ভুরিভুরি। বিভিন্ন গবেষণা এবং জরিপও এর সত্যতা নিশ্চিত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (OHW)এর দুজন



বিশেষজ্ঞ ড. জোছ মানুয়েল ও গবেষক এলিজান্দ্রার গবেষণায় আত্মহত্যার সাথে ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়টি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে কথাটি উঠে এসেছে। তারা এ মর্মে নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বব্যাপি আত্মহত্যাকারীদের বেশিরভাগ নাস্তিক বা ধর্ম অবিশ্বাসকারী। তাদের গবেষণার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:



প্রতি (১০০,০০০)মানুষের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে আত্মহত্যার হার।



আল্লাহর প্রতি ঈমানই হলো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

-ইমাম শাফী রহ.